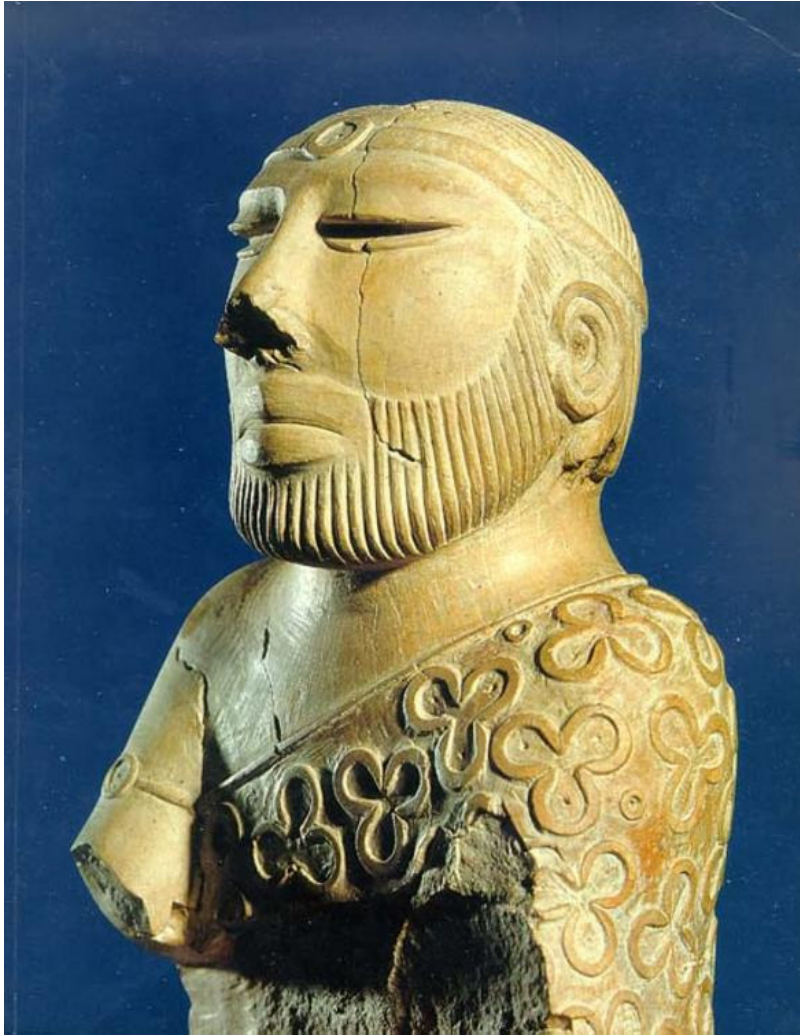


ইতিহাসের আগের ভারত

৯০৯২

অর্ণব দত্ত



বঙ্গভারতী

কলকাতা

ইতিহাসের আগের ভারত

(বঙ্গভারতী ব্লগসাইটে প্রকাশিত প্রাগৈতিহাসিক ভারতও সিন্ধু সভ্যতানিবন্ধদ্বয় একত্রে)

অর্ণব দত্ত

প্রথম সংস্করণ— আশ্বিন, ১৪১৯ (সেপ্টেম্বর, ২০১২)

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

বইটি বিনামূল্যে প্রচার করা চলবে। কিন্তু এর কোনো অংশ লেখকের
অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো ব্লগ বা পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশ করা চলবে না।
বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বঙ্গভারতীর পক্ষে <http://bangabharati.wordpress.com/> থেকে প্রকাশিত

০০.০০ টাকা

বঙ্গভারতী

কলকাতা

মুখবন্ধ

এই বইটিতে প্রকাশিত *প্রাগৈতিহাসিক ভারত ও সিদ্ধুসভ্যতা* নিবন্ধদুটি ইতিপূর্বে আমার ব্যক্তিগত ব্লগসাইট "বঙ্গভারতী"-তে প্রকাশিত হয়েছে। ব্লগের স্ট্যাট অনুযায়ী, এর মধ্যে সিদ্ধুসভ্যতা নিবন্ধটি বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই বইতে দুটি নিবন্ধই যুক্ত করা হল, কারণ বিষয়গতভাবে একটি নিবন্ধ অপরটিকে বুঝতে সাহায্য করে। বইটিতে ব্যবহৃত ছবিগুলির সবকটিই উইকিপিডিয়া সূত্রে পাওয়া। এই বইতে আমার কোনো ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশিত হয়নি। আমি নানা গ্রন্থ থেকে তথ্যাবলি আহরণ করে একটি তথ্যমালা গাঁথার চেষ্টা করেছি মাত্র। সাধারণ পাঠক, ইতিহাসের সাধারণ পড়ুয়া এবং এই বিষয়ে যাঁরা প্রথম অবগত হয়েছেন, তাঁদের বইটি কাজে লাগলেই আমার শ্রম সার্থক জানব।

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচিপত্র

প্রাগৈতিহাসিক ভারত... .. ৫
সিন্ধুসভ্যতা... .. ৮

প্রাগৈতিহাসিক ভারত

প্যালিওলিথিক যুগ বা প্রাচীন প্রস্তর যুগ

ভারতে মানুষের অস্তিত্বের সবচেয়ে পুরনো যে নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়েছে তা ৪,০০,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২,০০,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ের। অর্থাৎ, পরিভাষায় যাকে বলে দ্বিতীয় আন্তঃহিমযুগ, সেই যুগের। অধুনা পাকিস্তানের সোয়ান উপত্যকা ও দক্ষিণ ভারতে (প্রধানত চেন্নাইয়ের আশেপাশে) এই সময়কার অনেক প্রাচীন পাথরের যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন প্রস্তর যুগীয় বা প্যালিওলিথিক আদিম মানুষের অস্তিত্ব ছিল ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই সময়কার মানুষ ঠুকরে ভাঙা পাথর দিয়ে তৈরি নানা জিনিস ব্যবহার করত। সিন্ধু, গঙ্গা ও যমুনা নদীর পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চল ছাড়া ভারতের আর সব অঞ্চলেই এই সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে। শক্তপোক্ত চকমকি পাথর দিয়ে সহজে ফলা তৈরি করা যেত। তাই এই পাথরের ব্যবহারই ছিল বেশি। পাথরের যন্ত্রপাতি নানা কাজে লাগত। যেমন, মৃত জন্তুর চামড়া ছাড়ানো, মাংস কাটা বা হাড় ছাড়ানো ইত্যাদি। এই সময়কার মানুষ মূলত ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক। খাদ্যের জন্য মানুষ পুরোপুরি নির্ভর করত প্রকৃতির উপর। খেত শিকার করা পশুর মাংস আর ফলমূল। পরে আগুনের ব্যবহার শেখার পরে তাদের জীবনযাত্রার ধরন একেবারে আমূল বদলে যায়। তারা পশুর চামড়া, গাছের বাকল আর বড়ো বড়ো পাতা পোষাক হিসেবে ব্যবহার করত আর নারী, পুরুষ ও শিশু নিয়ে গঠিত ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াত।

প্যালিওলিথিক যুগের শেষ দিকে, ৩৬,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ আধুনিক মানব প্রজাতি হোমো সেপিয়েন্সের আবির্ভাব ঘটে।

মেসোলিথিক যুগ বা মধ্য প্রস্তর যুগ

৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু হয় মধ্য প্রস্তর যুগ বা মেসোলিথিক যুগ। ভারতে এই যুগ স্থায়ী হয়েছিল ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

এই মধ্যবর্তী যুগের প্রধান জিনিসগুলি ছিল মাইক্রোলিথ, অর্থাৎ কোণবিশিষ্ট বা অর্ধ-চন্দ্রাকার ফলা ইত্যাদি। এগুলির সাহায্যে দ্রুতগামী পশু মারা হত। মধ্যভারতের ছোটোনাগপুর মালভূমি ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা নদীর উপত্যকায় অনেক মেসোলিথিক স্থান পাওয়া গিয়েছে।



মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা প্রস্তরক্ষেত্রের প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র

এই সময় থেকে মানুষের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ধরনের আর ভাল মানের খাদ্য সংগ্রহের প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতাই পরে চাষাবাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

নিওলিথিক বা নব্য প্রস্তর যুগ

খাদ্য উৎপাদনের যুগ। মানুষ এই সময় তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী পুরোপুরি বদলে ফেলে। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় নিওলিথিক যুগ শুরু হয় ৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। কিন্তু ভারতে এই যুগ শুরু হয়েছিল ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। নিওলিথিক মানুষের বাস ছিল উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যে। বালুচিস্তানে পাওয়া নিওলিথিক বসতিটি সবচেয়ে পুরনো, প্রায় ৩,৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের।



কেরলের এডাক্কল গুহায় প্রস্তর যুগের লিপি

পশুপালন ও চাষাবাদ এই সময় শুরু হয়। সম্ভবত প্রথম পোষ মানানো হয় কুকুর, ছাগল ও ভেড়া। গম আর যম সম্ভবত মানুষের চাষ করা প্রথম খাদ্যশস্য। পশুপালন ও

চাষাবাদের ফলে নির্দিষ্ট জায়গায় বসতি স্থাপনের প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে উদ্ভব হয় গ্রাম ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের।

ব্যবহার্য যন্ত্রপাতিগুলিও যায় বদলে। মাটি খোঁড়ার জন্য ভারি দণ্ড, কাটার জন্য কাস্তে, গাছ কাটার জন্য কুঠার, শস্য গুঁড়ো করার জন্য জাঁতা ও হামান, অতিরিক্ত শস্য ও তরল পদার্থ রাখার জন্য নানা ধরনের মাটির হাঁড়ি তৈরি করা হয়। লোকে গেরুয়া রঙের পাত্র ব্যবহার করত। চাকা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

ক্যালকোলিথিক বসতি

নিওলিথিক যুগের শেষে ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়। এটিই ছিল ক্যালকোলিথিক পর্ব (১,৮০০-১,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। পর্বান্তরের এই পর্বে তামা-ব্রোঞ্জ ও পাথরের ব্যবহার মানুষের জীবনধারায় অনেক পরিবর্তন আসে। ছোটোনাগপুর মালভূমি থেকে উচ্চ গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত ক্যালকোলিথিক বসতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ব্রহ্মগিরি (মহীশূরের কাছে) ও নবদা টোলিতেও (নর্মদার তীরে) কয়েকটি ক্যালকোলিথিক বসতি পাওয়া গিয়েছে। এই সময় ক্রিট, মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় ব্রোঞ্জ সভ্যতার বিকাশের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু ভারতে ব্রোঞ্জের ব্যবহার দেখা যায় না। তাম্র-প্রস্তর যুগ হরপ্পা সভ্যতার থেকেও আধুনিক। কিন্তু সেই সভ্যতার উচ্চ প্রযুক্তিবিদ্যার আলো এই মানুষগুলির উপর পড়েনি।

সিন্ধু সভ্যতা

১৯২২-২৩ সাল নাগাদ ব্রিটিশ পুরাতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শালের ভারতীয় সহকারী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদাড়ো এলাকায় বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতাটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তার কিছুদিন আগেই মহেঞ্জোদাড়োর কয়েকশো মাইল উত্তরে অধুনা পাকিস্তানেরই পাঞ্জাব প্রদেশের মন্টগোমারি জেলার হরপ্পায় একটি প্রাচীন শহরের চার-পাঁচটি স্তরবিশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এরপর অধুনা ভারতের রাজস্থানের কালিবঙ্গান, চণ্ডীগড়ের কাছে রূপার, গুজরাতের আমেদাবাদের কাছে লোথাল, গুজরাতেরই কচ্ছ জেলার ধোলাবীরা, হরিয়ানার হিসার জেলার বনোয়ালিতে এবং অধুনা পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের কোট দিজি ও চানহুদাড়ো এবং পাকিস্তান-ইরান সীমান্তের কাছে বালুচিস্তান প্রদেশের সুতকাজেন-ডোরেও অনুরূপ শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকরা মনে করেন, এই সব শহর একটি স্বতন্ত্র সভ্যতার অন্তর্গত ছিল। এই সভ্যতাই সিন্ধু সভ্যতা, মেসোপটেমিয়ান সাহিত্যে সম্ভবত যার নাম মেলুহা। ঐতিহাসিকেরা একে সিন্ধু-ঘগ্নর-হাকরা সভ্যতা বা সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতাও বলে থাকেন। এই সভ্যতা ছিল তাম্র-ব্রোঞ্জ (ক্যালকোলিথিক) যুগের সভ্যতা; কারণ, লোহার ব্যবহার এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অজ্ঞাতই ছিল। এই সভ্যতার সামগ্রিক সময়কাল ধরা হয় ৫৫০০-১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।



সিন্ধু লিপি

বিবর্তন

ঠিক কোন সময় এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা জানা যায় না। ১৯৬৮ সালে স্যার মর্টিমার হুইলার বলেছিলেন, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা মেসোপটেমিয়া অঞ্চল থেকে এখানে এসেছিলেন। এখানকার স্থানীয়দের সভ্যতার সঙ্গে তাদের সভ্যতার কোনো মিল ছিল না। যদিও পরবর্তীকালের গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে এখানকার স্থানীয় সভ্যতাই বিবর্তনের মাধ্যমে সিন্ধু সভ্যতায় পরিণত হয়। বোলান গিরিপথের কাছে অধুনা

মেহেরগড় নামে এক অঞ্চল থেকে কৃষিজীবী সম্প্রদায় প্রথম সিন্ধু উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে। সিন্ধু উপত্যকা ছিল উর্বর সমভূমি। তাই চাষাবাদও হল ভাল। ধীরে ধীরে তারা শিখে নিল বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কৌশলও। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রাব্দেই এখানকার মানুষ গম ও যব চাষ এবং ভেড়া ও ছাগল প্রতিপালন শুরু করে দিয়েছিল। তারপর জনসংখ্যা যত বাড়ল, তত গড়ে উঠতে লাগল নতুন নতুন লোকবসতি। কোয়েটা উপত্যকায় ডাম্ব-সদাল প্রত্নক্ষেত্রে ইঁটের দেওয়াল-বিশিষ্ট একটি স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটির নির্মাণকাল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনালগ্ন। এখানে যেসব ছবি-আঁকা মাটির হাঁড়ি পাওয়া গেছে, তেমন হাঁড়ি পাওয়া গিয়েছে সমসাময়িককালে আফগানিস্তানে গড়ে ওঠা বসতিগুলির ধ্বংসাবশেষেও। তাছাড়া ডাম্ব-সদালের মাটির সিলমোহর ও তামার জিনিসপত্রও ব্যবহার করত। পশ্চিম সিন্ধু সমভূমিতে রেহমান ধেরি নামে এক জায়গায় সিন্ধু সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে গড়ে ওঠা একটি শহরের ধ্বংসস্তুপ পাওয়া গেছে। এই সব প্রত্নক্ষেত্রগুলিই প্রমাণ যে, সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে পারস্য উপসাগরীয় শহরগুলির এবং মধ্য এশিয়ার যোগাযোগ ছিল।

প্রাক-হরপ্পা থেকে পূর্ণ-হরপ্পা (mature Harappan) সভ্যতায় রূপান্তরনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা। দক্ষিণ-পূর্ব বালুচিস্তানের এই জায়গায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনাকালে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। এখানকার অধিবাসীরা পাথর বা কাদামাটি দিয়ে তৈরি ইঁটের বাড়িতে বাস করত। এক ধরনের শস্যগারও গড়ে তুলেছিল তারা। এখানকার পাতলা মাটির পাত্রে কুঁজওয়ালা ঝাঁড়ের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বেশ কয়েক ধাপ বিবর্তনের পর এই সভ্যতাই শেষে যাকে আমরা হরপ্পা সভ্যতা বলে থাকি, সেই সভ্যতা গড়ে তোলে।

একনজরে সিন্ধু সভ্যতার বিবর্তনের কালরেখাটি হবে নিম্নরূপ (সাল খ্রিস্টপূর্বাব্দের):

* অঞ্চলকরণ যুগ

** মেহেরগড় দুই-চার – ৫৫০০- ৩৩০০

** আদি হরপ্পা (আদি ব্রোঞ্জ যুগ) – ৩৩০০- ২৬০০

** হরপ্পা- এক (ইরাবতী পর্ব) – ৩৩০০- ২৮০০

** হরপ্পা- দুই (কোট দিজি পর্ব, নৌসারো- এক, মেহেরগড়- আট) – ২৮০০- ২৬০০

** পূর্ণ হরপ্পা (মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ) – ২৬০০- ১৯০০

* সংহতি যুগ

** হরপ্পা ত্রক (নৌসারো- দুই) – ২৬০০- ২৪৫০

** হরপ্পা ৩খ – ২৪৫০- ২২০০

** হরপ্পা ৩গ – ২২০০- ১৯০০

* স্থানীয়করণ যুগ

** শেষ হরপ্পা (সমাধিক্ষেত্র এইচ) (শেষ ব্রোঞ্জ যুগ) – ১৯০০- ১৩০০

** হরপ্পা ৪ – ১৯০০- ১৭০০

** হরপ্পা ৫ – ১৭০০- ১৩০০

সাম্প্রতিক কার্বন- ১৪ তারিখ নির্ণয় পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে, পূর্ণ হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০/২৯০০ থেকে ১৮০০ অব্দ। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার যোগাযোগের প্রমাণও এই পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে।

ভৌগোলিক বিস্তার

ভৌগোলিক বিস্তারের দিক থেকে বিচার করলে সিন্ধু সভ্যতা ছিল প্রাচীন পৃথিবীর বৃহত্তম সভ্যতা। এখন একথা প্রমাণিত যে, সিন্ধু সভ্যতা কেবল সিন্ধু উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ঐতিহাসিকেরা যদিও হরপ্পা- ঘগ্গর- কালিবঙ্গান- মহেঞ্জোদাডো অঞ্চলটিকেই এই সভ্যতার কেন্দ্রস্থল মনে করেন; কারণ, হরপ্পার প্রধান বসতিগুলি এই অঞ্চলেই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সভ্যতার সামগ্রিক বিস্তার ছিল গোটা সিন্ধুপ্রদেশ, বালুচিস্তান, প্রায় সমগ্র পাঞ্জাব অঞ্চল, উত্তর রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং গুজরাতের কাঠিয়াওয়াড় ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চল জুড়ে। মনে রাখতে হবে, সেই সময় সিন্ধুপ্রদেশ ও রাজস্থানে আজকের মতো মরুভূমি ছিল না; উত্তর- পশ্চিম ভারতের আবহাওয়াও ছিল যথেষ্টই আর্দ্র।

এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে প্রায় ১৪০০টি বসতির হদিস। উত্তর- দক্ষিণে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার এবং পূর্ব- পশ্চিমে প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ এই সভ্যতার পশ্চিম সীমা ছিল বালুচিস্তানের সুতকাজেন- ডোর, পূর্ব সীমা ছিল উত্তরপ্রদেশের মিরাত জেলার আলমগীরপুর, দক্ষিণ সীমা ছিল মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলার দাইমাবাদ এবং উত্তর সীমা ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর জেলার মান্দা পর্যন্ত। সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর উপত্যকায় সিন্ধু সভ্যতার বসতি অঞ্চলগুলি প্রায় ১২,৫০,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। অর্থাৎ, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার থেকে ভৌগোলিক আয়তনের বিচারে এই সভ্যতা ছিল ২০ গুণ এবং প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়া সভ্যতার মিলিত এলাকার তুলনায় ছিল ১২ গুণ বড়ো।

প্রধান শহর

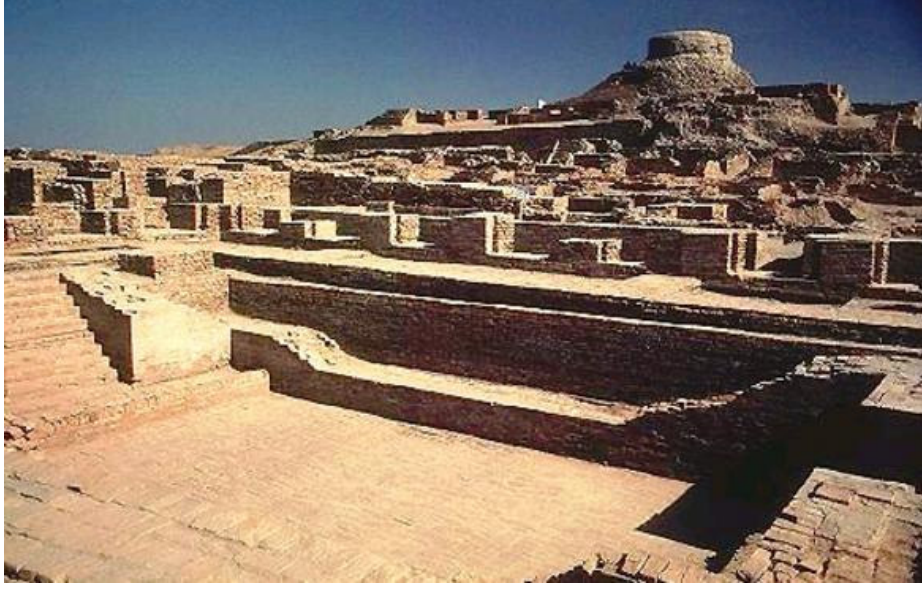
হরপ্পা



হরপ্পার পোড়ামাটির খেলনা

অধুনা পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মন্টগোমারি জেলায় ইরাবতী (রাবি) নদীর বাঁ তীরে অবস্থিত হরপ্পা। এটিই প্রথম আবিষ্কৃত শহর। ১৯২১ সালে দয়ারাম সাহানি এই শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। মনে করা হয়, হরপ্পাই ছিল সিন্ধু সভ্যতার প্রধান শহর। নগর পরিকল্পনা ঝাঁঝরি (গ্রিড) আকারবিশিষ্ট। লক্ষণীয়, শহরের চারপাশে বসতিপুঞ্জ নেই। শহরের জনগোষ্ঠীর একটি বৃহত্তর অংশ খাদ্য উৎপাদন ছাড়া প্রশাসন পরিচালনা, বাণিজ্য, হস্তশিল্প, ধর্ম ইত্যাদি অন্যান্য কাজেও নিয়োজিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। অন্যান্য শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হরপ্পা সম্ভবত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সড়কের উপর অবস্থিত ছিল, যা হরপ্পার সঙ্গে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান ও জম্মুর সংযোগ- রক্ষা করত। এই ধরনের সড়কের অস্তিত্ব আজও রয়েছে। হরপ্পায় বিচ্ছিন্নভাবে কফিন সমাধির অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। কফিন সমাধি গোটা সিন্ধু সভ্যতায় একমাত্র হরপ্পাতেই পাওয়া গিয়েছে। আবার এখানে বিদেশিদের একটি সমাধিও (সমাধিক্ষেত্র- এইচ) পাওয়া গিয়েছে। আর পাওয়া গিয়েছে ছটি শস্যগারের একটি সারি।

মহেঞ্জোদাড়ো



মহান্মানাগার, মহেঞ্জোদাড়ো

সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায় সিন্ধু নদের ডান তীরে অবস্থিত মহেঞ্জোদাড়ো। ১৯২২ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এটিই ছিল হরপ্পা সভ্যতার বৃহত্তম শহর। জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫,০০০; যা সেই যুগের হিসেবে যথেষ্ট বেশি। খননকার্যের ফলে জানা গেছে, মানুষ এখানে অনেক দিন ধরেই বাস করছিল। তাই একই জায়গায় বাড়িঘর বারবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। এই জন্য বাড়ি ও ধ্বংসস্তুপ এখানে ৭৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু। এছাড়া এখানে নিয়মিত চাষাবাদও হত। ফলে মাটির অবক্ষিপণও দেখা গেছে। হরপ্পার মতো মহেঞ্জোদাড়োর নগর পরিকল্পনা ঝাঁঝরি আকারবিশিষ্ট। এখানে একটি বড়ো শস্যাগার, একটি বড়ো স্নানাগার এবং একটি কলেজ পাওয়া গিয়েছে। শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবসস্থায় পাওয়া নরকঙ্কালগুলিকে ঐতিহাসিকেরা বহিরাক্রমণ ও গণহত্যার নিদর্শন মনে করেন। শহরের উপরের স্তরগুলিতে ঘোড়ার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতোকাটার টাকু, চরকা ও সূচের সঙ্গে একটুকরো বোনা কাপড়ও পাওয়া গিয়েছে এখান থেকে। দাড়িওয়ালা পুরুষের পাথরের মূর্তি এবং নর্তকীর ব্রোঞ্জ মূর্তি এখান থেকেও পাওয়া গিয়েছে। জানা গেছে, শহরের সাত বারেরও বেশি বন্যা হয়েছিল। একটি অদ্ভুত ছবিওয়ালা সিলমোহর পাওয়া গিয়েছে, যাতে দেখা যায় এক দেবীমূর্তির জঠর থেকে একটি গাছ বেরিয়ে এসেছে এবং এক পুরুষ ছুরি হাতে এক নারীকে বলি দিতে চলেছে।

সুতকাজেন-ডোর

সুতকাজেন-ডোর পাকিস্তান-ইরান সীমান্তের কাছে বালুচিস্তান প্রদেশের দাস্ত নদের তীরে অবস্থিত। ১৯২৭ সালে আর. এল. স্টেইন এই প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন। এখন

এটি চারদিক দিয়ে স্থলবেষ্টিত এবং শুষ্ক অনুর্বর অঞ্চলে অবস্থিত। শহরে পাথরের প্রাচীরঘেরা একটি দুর্গ ছিল। সম্ভবত সমুদ্রবাণিজ্যে সহায়তা করার জন্য এমন অনুর্বর স্থানে শহরটি গড়ে তোলা হয়েছিল।

কালিবঙ্গান



কালিবঙ্গানের ধ্বংসস্তুপ

ভারতের রাজস্থান রাজ্যে ঘগ্গর নদের একটি অধুনা-লুপ্ত খাতের ধারে অবস্থিত কালিবঙ্গান। ১৯৫৩ সালে অমলানন্দ ঘোষ এই প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন। ১৯৬০ সালে বি. কে. থাপারের তত্ত্বাবধানে এখানে খননকার্য চালানো হয়। এই অঞ্চল সবচেয়ে বেশি জনবহুল ছিল। এখানে প্রাক-হরপ্পা যুগ থেকে জনবসতির অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। এখানে কর্ষিত জমি, কাঠের লাঙল, সাতটি অগ্নিবেদী ও উটের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কালিবঙ্গানের অনেক বাড়িতেই নিজস্ব কুয়ো ছিল। এছাড়া এখানে দুই ধরনের সমাধিক্ষেত্র পাওয়া গিয়েছে – আয়তাকার কবরযুক্ত সমাধি ও গোলাকার কবরযুক্ত সমাধি।

চানছ-দাড়ো

সিন্ধুপ্রদেশে সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত। ১৯৩১ সালে ননীগোপাল মজুমদার এই শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই শহরে কোনো নগরদুর্গ (সিটাডেল) ছিল না। পুঁতির মালার শিল্প এখানে বিখ্যাত ছিল। একটি ক্ষুদ্র পাত্র পাওয়া গিয়েছে, সেটি সম্ভবত দোয়াত। একটি কুকুর বিড়াল তাড়া করেছে, এমন কয়েকটি পদচিহ্নও পাওয়া গিয়েছে। তামা ও ব্রোঞ্জনির্মিত গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং চালকের আসনের প্রমাণ মিলেছে। এই শহরে

তিনটি পৃথক সাংস্কৃতিক স্তর দেখা যায়, যেগুলিকে সিন্ধু, বুকর ও ঝাঙর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমরি

সিন্ধুপ্রদেশেই সিন্ধু নদের তীরে ননীগোপাল মজুমদার ১৯৩৫ সালে আবিষ্কার করে আমরির ধ্বংসাবশেষ। এখানে একটি কৃষ্ণসার হরিণের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। (‘বিবর্তন’ অংশে আমরির সম্পর্কে আরও তথ্য দেওয়া হয়েছে)

লোথাল, রংপুর ও সুরকোটাদা



লোথালের পোতাশ্রয়

ভারতের গুজরাত রাজ্যে খাম্বাত উপসাগরের উপকূলীয় সমভূমিতে ভাগবা নদীর তীরে লোথাল অবস্থিত। ১৯৫৩ সালে এস. আর. রাও এই সব অঞ্চলের প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। সেই বছরই এম. এস. বৎস, বি. বি. লাল ও এস. আর. রাও লোথালের কাছে মাহার নদের তীরে রংপুর প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন। ১৯৬৪ সালে জে. পি. যোশী গুজরাতের কচ্ছ (ভুজ) জেলায় আবিষ্কার করেন সুরকোটাদা প্রত্নক্ষেত্র।

বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বন্দর ও পোতাশ্রয় লোথালেই তৈরি হয়েছিল। সমসাময়িক পশ্চিম এশীয় দেশগুলির সঙ্গে এই শহরগুলির মাধ্যমে সমুদ্রবাণিজ্য চলত। এখানে একটি সুন্দর পরস্পরকে ব্যবচ্ছেদকারী গোলাকার নকশাসহ মেঝে আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি টেরাকোটা ঘোড়ামূর্তি ও খেলনা নৌকা পাওয়া গিয়েছে এখানে। পাওয়া গিয়েছে আধুনিক কম্পাসের

মতো একটি দিক-নির্ণায়ক যন্ত্রও। হরপ্পা সভ্যতার অন্যান্য শহরে বাড়ির সদর দরজা বড়ো রাস্তার দিকে নয়, ধারে। কিন্তু লোথালে বাড়ির দরজা বড়ো রাস্তারই দিকে। এখানে যুগ্মসমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে।

রংপুরই একমাত্র হরপ্পা প্রত্নক্ষেত্র যেখানে ধানের ভুসি পাওয়া গিয়েছে। সুরকোটাদায় পাওয়া গিয়েছে ঘোড়ার হাড়গোড় এবং পুতির মালার দোকান।

ধোলাবীরা



ধোলাবীরা

১৯৮৫-৯০ নাগাদ আর. এস. বিশত কচ্ছেরই রান অঞ্চলে আবিষ্কার করেন ধোলাবীরা প্রত্নক্ষেত্র। এখানে সাতটি সাংস্কৃতিক পর্যায় দেখা যায়। এটি सिन्धু সভ্যতার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রত্নক্ষেত্র। ধোলাবীরার শহরটি তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল। এই শহরে জল সরবরাহ ও নির্গমন ব্যবস্থা ছিল নজরকাড়া।

বনওয়ালি

ভারতের হরিয়ানার হিসার জেলায় অবস্থিত বনওয়ালি প্রত্নক্ষেত্রটি ১৯৭৪ সালে আর. এস. বৎস আবিষ্কার করেন। এখানে আদি হরপ্পা ও হরপ্পা উভয় পর্যায়ের জনবসতির সন্ধান মিলেছে। বনওয়ালি প্রচুর যব চাষ হতো।

কোট দিজি

১৯৫৩ সালে ফজল আহমেদ সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত কোট দিজি প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন। এখানে মাটির রঙিন চাকা ও পাঁচটি দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এখানে প্রতিরক্ষা প্রাচীর ও পথের ধারে সার দেওয়া কুয়ের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এখানকার লোকেরা ধাতুশিল্প ও খেলনানির্মাণ শিল্পে পটু ছিল।

রূপার

১৯৫৩ সালে ওয়াই. ডি. শর্মা পাঞ্জাবে শতদ্রু নদীর তীরে রূপার প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন। হরপ্পা ছাড়াও এখানে কুষাণ-গুপ্ত এমনকি মধ্যযুগীয় সভ্যতার সন্ধান মিলেছে। এখানে একটি আয়তাকার ইঁটের কক্ষ পাওয়া গিয়েছে। এখানকার সমাধিক্ষেত্রে মানুষের পাশে একটি কুকুরও সমাহিত করা হত।

বালাকোট

১৯৬৩-৭৬ নাগাদ জর্জ এফ. ডেলস আরব সাগরের ধারে বালাকোট প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন। এখানে প্রাক-হরপ্পা ও হরপ্পা উভয় সভ্যতার নিদর্শন দেখা যায়। এখানেও পুতির মালা তৈরির শিল্পের অস্তিত্ব ছিল।

আলমগিরপুর

১৯৫৮ সালে ওয়াই. ডি. শর্মা উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার হিন্দনে আলমগিরপুর প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন। এটিকেই সাধারণত সিন্ধু সভ্যতার পূর্ব সীমা ধরা হয়। এখানে আবিষ্কৃত একটি পাত্রে কাপড়ের ছবি দেখা যায়।

সাম্প্রতিককালে রফিক মুঘল পাকিস্তানের গানভেরিওয়ালা ও হরিয়ানার জিন্দের রাখি গাড়িতেও সিন্ধু সভ্যতার দুটি প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কার করেছেন। রাখি গাড়িই এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো প্রত্নক্ষেত্র।

নগর পরিকল্পনা

হরপ্পা সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর নগর পরিকল্পনা। হরপ্পার বসতি অঞ্চল গঠিত ছিল ছোটো ছোটো শহর নিয়ে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, লোথাল ও সুতকাজেন-ডোর শহরগুলি ছিল একই পরিকল্পনাধীনে নির্মিত। নগর পরিকল্পনা ও নির্মাণে যথেষ্ট আধুনিক ছিল হরপ্পার মানুষ। শহরগুলি ছিল আয়তাকার। প্রতিটি শহরের পশ্চিমভাগে একটি উঁচু এলাকায় ছিল দুর্গ। এটি সম্ভবত ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের আবাসস্থল। প্রাচীরঘেরা এই সব দুর্গের মধ্যেই থাকত প্রশাসনিক ও ধর্মীয় ভবনগুলি। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর দুর্গ ছিল ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কালিবঙ্গানে দুর্গ ও শহর দুটিই ছিল পাঁচিলঘেরা। দুর্গের নিচে ছিল শহরের মূল এলাকা। এটি ছিল সাধারণ মানুষের আবাসস্থল। এই অংশ দাবার বোর্ডের মতো ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল।

প্রতিটি শহরেই শহরের মূল রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত দেখা যায়। অন্যান্য রাস্তাগুলি প্রধান রাস্তার সঙ্গে সমকোণে প্রসারিত। বাড়িগুলি রাস্তার দুই ধারে অবস্থিত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োয় দেখা যায় আগুনে পোড়ানো ইঁটের বাড়ি। লোথাল ও কালিবঙ্গানে

দেখা যায় রোদে পোড়ানো ইঁটের বাড়ি। প্রতিটি বাড়িতে রান্নাঘর ও স্নানাগার ছাড়াও চার থেকে ছটি কক্ষ থাকত। বড়ো বড়ো বাড়িতে তিরিশটি কামরাও দেখা গিয়েছে। বড়ো বাড়িতে কামরাগুলি থাকত একটি বর্গাকার উঠানের চার পাশে। এই সব বাড়িতে সিঁড়ির উপস্থিতি দেখে মনে হয়, এগুলি দুই থেকে তিন তলা পর্যন্ত উঁচু হত। অনেক বাড়িতেই আলাদা কুয়ো ও নিকাশি নালা থাকত। নালার মাধ্যমে বর্জ্য জল বড়ো রাস্তার নর্দমায় গিয়ে পড়ত। কুয়ো- যুক্ত গণস্নানাগারও পাওয়া গিয়েছে। বড়ো রাস্তার নর্দমাগুলি মাটির তৈরি সকপিট ও ম্যানহোল দিয়ে ঢাকা থাকত। রাস্তায় আলোর ব্যবস্থাও থাকত। সমাধিক্ষেত্রগুলি সাধারণত শহরের বাইরে অবস্থান করত। হরপ্পা সভ্যতার উন্নত নগর পরিকল্পনা দেখে মনে করা হয় পুরসভা-জাতীয় কোনো সংস্থা নাগরিক পরিষেবা প্রদানের কাজে নিযুক্ত ছিল।



লোথালের পয়ঃপ্রণালী

নগরের আকার ছিল সামন্তরিক (প্যারালেলোগ্রামিক)। প্রামাণ্য আকারের পোড়া ও কাঁচা ইঁটের সহাবস্থান থেকে বোঝা যায় ইঁট শিল্প এখানকার একটি বড়ো শিল্প ছিল।

মহেঞ্জোদাড়োর দুর্গ এলাকায় ‘মহাস্নানাগার’ সবচেয়ে আশ্চর্য স্থাপনা। সম্ভবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো গণ-অনুষ্ঠানের জন্য এই মহাস্নানাগার ব্যবহৃত হত। এর পশ্চিমে রয়েছে একটি বিশাল শস্যগোলা। হরপ্পায় দুটি সারিতে মোট ছটি শস্যগোলায় সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় পথও রয়েছে। মহেঞ্জোদাড়োয় মহাস্নানাগারের পাশেই আরও একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এটি সম্ভবত

কোনো উচ্চ পদাধিকারীর বাসভবন ছিল। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হল সভাকক্ষ। অন্যদিকে লোথাল ও কালিবঙ্গানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হল অগ্নিবেদি।

বাসস্থানের আকার আয় ও পেশা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ছিল। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় যে দুই কামরা- বিশিষ্ট সারিবদ্ধ বাড়ি পাওয়া গেছে সেখানে সম্ভবত গরিব মানুষেরা থাকত। বড়ো বড়ো বাড়িগুলি ছিল ধনীদেব।

বাড়ি, রাস্তা, নর্দমা সবই ইঁট দিয়েই তৈরি করা হত। পাথরের ব্যবহার ছিল না বললেই হয়। ইঁটের তৈরি বাড়িঘর জিপসাম দিয়ে জলনিরোধক করা হত।

মনে রাখতে হবে, হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলি ছিল হয় বন্যাপ্রবণ নদী উপত্যকায়, নয় মরুভূমির প্রান্তে, নয়ত বা সমুদ্রের ধারে। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে এখানকার অধিবাসীরা ভালরকম পরিচিত ছিলেন। এই জন্যই হয়ত নগর পরিকল্পনা ও জনজীবনের প্রণালীতে কিছু বৈচিত্র্য দেখা যেত।

অর্থনীতি

কৃষি

সিন্ধুবাসীদের প্রধান কৃষিজ ফসল ছিল গম, যব, মটর, খেজুর, তিল ও সরষে। মোট দুই ধরনের গম ও যব উৎপাদিত হত। তিল ও সরষের তেল ব্যবহার করা হত। লোথালে ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ মানুষ ধান চাষও শুরু করেছিল। বনওয়ালিতে প্রচুর যব উৎপন্ন হত। হরপ্পার (মেহেরগড় পর্যায়ের) মানুষ বিশ্বের প্রাচীনতম তুলা-উৎপাদকদের অন্যতম।

নভেম্বর মাস নাগাদ বন্যার জল নেমে গেলে সিন্ধুবাসীরা সিন্ধু নদের প্লাবন সমভূমিতে শস্য রোপণ করত। এপ্রিল মাসে আবার বন্যা আসার আগেই ফসল কেটে নেওয়া হত। হরপ্পাবাসীরা সম্ভবত কাঠ বা তামার ফলায়ুক্ত কাঠের লাঙল ব্যবহার করত। কালিবঙ্গানেও কর্ষিত জমির প্রমাণ পাওয়া গেছে। বালুচিস্তান ও আফগানিস্তানের কোনো কোনো প্রত্নক্ষেত্রে গবরবাক্স বা নালার সাহায্যে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা থাকলেও, সাধারণভাবে সেচখালের ব্যবহার সিন্ধুবাসীরা জানত না। সেচ নির্ভর করত পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের অনিয়মিত বন্যার উপর।

পশুপালন

সিন্ধুবাসীরা কৃষিকাজের পাশাপাশি পশুপালনকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিত বলে মনে হয়। কারণ এখানে ব্যাপক হারে পশুপালনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ষাঁড়, মোষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগি ও শুয়োর পোষা হত। কুঁজওয়ালা ষাঁড় হরপ্পাবাসীরা বিশেষ পছন্দ করত বলে মনে হয়। কুকুর পোষার রেওয়াজ একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ছিল। বিড়ালও পোষা

হত। কুকুর বিড়াল তাড়া করেছে, এমন কিছু পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। গাধা ও উটের ব্যবহার হত ভারবাহী পশু হিসেবে। যদিও উটের ব্যবহার খুব কমই হত। হরপ্পাবাসীদের কাছে হাতিও পরিচিত ছিল, যেমন পরিচিত ছিল ভারতীয় গজর (আমরিতে যার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে), চিতল হরিণ, শম্বর হরিণ, বুনো গুয়ের ইত্যাদি। এই সব বন্য জন্তুর হাড়গোড় আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত খাদ্যের প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে বন্য জন্তুও শিকার করা হত। ঘোড়ার কিছু ছবি পাওয়া গেলেও, হরপ্পাবাসীরা সম্ভবত ঘোড়ার ব্যবহার জানত না।

ব্যবসাবাগিজ্য



মৃৎপাত্রের নমুনা

উন্নত কৃষি-অর্থনীতি সিন্ধুবাসীদের ব্যবসাবাণিজ্যেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাণিজ্য শুধু আভ্যন্তরীণ স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা ছড়িয়ে পড়েছিল পারস্য উপসাগর ও মেসোপটেমিয়ায়। হরপ্পাবাসীদের সিলমোহর ও হরপ্পাবাসী বণিক ও ব্যবসায়ীদের পণ্য সিল করার ছোটো ছোটো বস্তু মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধুবাসীদের সিলমোহর ও পণ্য পাওয়া গিয়েছে সুমেরেও। এর অর্থ মেসোপটেমিয়াতেও সিন্ধু বণিকেরা বাস করত। সম্ভবত সিন্ধুবাসীদের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল তুলো, যা রপ্তানি করা হত লোথাল বন্দরের মাধ্যমে। মেসোপটেমিয়ার সাহিত্য সাক্ষ্য দেয়, ২৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ মেলুহা অঞ্চলের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্য চলত। মেসোপটেমিয়ার সাহিত্যে উর শহরের বণিকদের কথা জানা যায় যাঁরা বৈদেশিক বাণিজ্য চালাতেন। উরের বণিকদের সঙ্গে যে বণিকদের যোগাযোগ ছিল তাদের মধ্যে তিলমুন, মাগান ও মেলুহা নাম তিনটি বেশি চোখে পড়ে। তিলমুন বলতে সাধারণত বাহরিন ও পারস্য উপসাগর-সংলগ্ন অঞ্চল বোঝায়। মাগান বলতে সম্ভবত ওমান বা দক্ষিণ আরবের কোনো অঞ্চল বোঝাত। মেলুহা (প্রাচীন আক্কাদিয়ান নাম) সম্ভবত ছিল ভারতের সৌরাষ্ট্র ও সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল। মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধুর মাঝে দিলমুন ও মাকান নামে দুটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। সিন্ধুবাসীদের সমুদ্রবাণিজ্যে দক্ষতার প্রমাণও পাওয়া যায়। গুজরাতে অনেক ছোটো ছোটো খেলনা পোড়ামাটির নৌকা পাওয়া গিয়েছে। লোথালে ইঁটের তৈরি একটি পোতাশ্রয়েরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তবে কোনো মুদ্রা পাওয়া যায়নি। মনে করা হয়, পণ্যবিনিময়ের মাধ্যমেই ব্যবসাবাণিজ্য চলত। যদিও পরিমাপের এককগুলি ছিল ভারি চমৎকার। বস্তুর ওজন মাপার জন্য নানা মাপের সুষম বাটখারা ব্যবহৃত হত।

মহেঞ্জোদাড়ো সিন্ধু সভ্যতার একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র ছিল। মনে করা হয়, বয়নশিল্পই ছিল এখানকার প্রধান শিল্প। হরপ্পাবাসীরা ডাইং বা রঞ্জনকার্য সম্পর্কে অবহিত ছিল। মৃৎশিল্পও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল। হরপ্পাবাসীদের চিত্রলিখনগুলি পাওয়া গিয়েছে মাটির পাত্রের গায়েই। এই সব মাটির পাত্র তৈরি হত কুমোরের চাকায়। তারপর নিকটবর্তী এমনকি দূরবর্তী চুল্লিগুলিতে পোড়ানো হত। এইসব মৃৎপাত্র রপ্তানিও করা হত। হরপ্পাবাসীরা ধাতু গলানোর শিল্পও জানত। সীসা, ব্রোঞ্জ ও টিন খুবই ব্যবহৃত হত। বড়ো বড়ো ইঁটের স্থাপনা দেখে মনে হয় ইঁট শিল্পও এখানকার খুব বড়ো শিল্প ছিল। প্রস্তরশিল্পের উদাহরণ অল্প হলেও কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পাবাসীরা নৌকা-নির্মাণ, সিলমোহর-প্রস্তুতি ও পোড়ামাটির শিল্পে নিযুক্ত ছিল। লোথাল ও চানহুদাড়োতে পুঁতি-শিল্পীরাও বাস করত।

হরপ্পার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্প ও শিল্পকেন্দ্রের নাম নিচে দেওয়া হল:

প্রস্তরশিল্প – লেভান, সুকার, লোথাল।

ধাতুশিল্প – লোথাল, চানহুদাড়ো।

মুক্তাশিল্প – বালাকোট, চানহুদাড়ো।

চুড়ি শিল্প – বালাকোট, চানহুদাডো।

চানহুদাডো – পুঁতিশিল্প।

যেসব জিনিস স্থানীয়ভাবে পাওয়া যেত না, তাই আমদানি করা হত। যেমন: তামা – দক্ষিণ ভারত, বালুচিস্তান, আরব, খেতরি (রাজস্থান)।

সোনা – কর্ণাটক, আফগানিস্তান ও পারস্য (ইরান) থেকে।

রূপো – আফগানিস্তান ও পারস্য থেকে।

টিন – পশ্চিম ভারত।

শীষা – রাজস্থান, দক্ষিণ ভারত, আফগানিস্তান, পারস্য।

লাপিস লাজুলি – উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের বাদাকশান, কাশ্মীর।

নীলকান্তমণি (টারকোয়াজ) – মধ্য এশিয়া, পারস্য।

যসম (জেড) – মধ্য এশিয়া।

পান্না (অ্যামেথিস্ট) – মহারাষ্ট্র থেকে।

অকীক (অ্যাজেট) – পশ্চিম ভারত।

ক্যালসেড্যানি ও কার্নেলিয়ান – সৌরাষ্ট্র।

সম্ভবত, হরপ্পার ব্যবসাবাণিজ্য সক্রিয় এবং অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতেই গুজরাতের সুরকাতাদা বা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলেও শহর স্থাপন করে হরপ্পার মানুষেরা।

সিলমোহর ও মুদ্রাব্যবস্থা

সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নক্ষেত্রগুলি থেকে হাজার হাজার সিলমোহর পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এগুলি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হত কিনা তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তাই মনে করা হয়, সিন্ধুবাসীরা সম্ভবত পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমেই ব্যবসাবাণিজ্য চালাত।

প্রত্যেক বণিক পরিবারের নিজস্ব প্রতীক ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত স্ট্যাটাইট বা নরম পাথর দিয়ে তৈরি সিলমোহর ছিল। পাথরগুলিকে কেটে পালিশ করা হত। এই ধরনের সাদা পালিশ ছিল সিন্ধুবাসীদের বৈশিষ্ট্য। দুই ধরনের সিলমোহর পাওয়া গিয়েছে: প্রাণীর ছবি ও বিবরণ সহ বর্গাকার সিল ও শুধু বিবরণসহ আয়তাকার সিল। প্রথম ধরনের

সিলমোহরই বেশি পাওয়া গিয়েছে। ইউনিকর্ন বা একশৃঙ্গ-ঘোড়া সিলমোহরে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পশুর ছবি।



সিন্ধুবাসীদের সিলমোহর

পরিবহণ ব্যবস্থা

হরপ্পাবাসীদের যোগাযোগ ব্যবস্থাও যথেষ্ট ভাল ছিল। সিলমোহর ও মৃৎপাত্রের গায়ের ছবিতে জাহাজ ও নৌকার ছবি দেখে মনে হয় তারা আরব সাগরে সমুদ্রবাণিজ্যেও লিপ্ত ছিল। এমনকি মহেঞ্জোদাড়োতেও জাহাজের ছবি দেওয়া সিলমোহর পাওয়া গিয়েছে। স্থলপথে বাণিজ্য চলত মূলত বলদের গাড়িতে। ঘোড়ার গাড়ির ব্যবহার খুবই কম ছিল।

শিল্পকলা

হরপ্পাবাসীরা নানা পেশায় নিযুক্ত থাকত। তার মধ্যে ছিল: চরকায় সুতো বা পশম কাটা, কুমোরের কাজ, মালা তৈরি (সোনা, রূপো, তামা, চিনামাটি, স্ট্যাটাইট, অর্ধ-মূল্যবান পাথর, বিনুক ও হাতির দাঁতের পুতি দিয়ে) এবং সিলমোহর তৈরি (চৌকো বা পাতার আকারের হাতির দাঁত, চিনামাটি বা স্ট্যাটাইট দিয়ে)। সিলমোহরগুলি বেশ সুন্দর চকচকে হত; এতে খোদাই করা থাকত পশুপাখি, মানুষ ও দেবদেবীদের ছবি। পোড়ামাটির কাজও ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রচুর পোড়ামাটির খেলনা পাওয়া গিয়েছে। ইঁট তৈরিও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। প্রধানত লাল মাটি দিয়ে মাটির পাত্র তৈরি করা হত। এগুলি ধাতুর মতো চকচক করত। পাত্রগুলির গায়ে কালো ব্যান্ডের অলংকরণ থাকত। মাঝে মাঝে পশুপাখি বা জ্যামিতিক আকার-আকৃতিও মৃৎপাত্রের গায়ে আঁকা হত। বেশ কিছু পেডেস্টাল ডিশ,



মহেঞ্জোদাড়োর নর্তকীমূর্তি

পানপাত্র, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জার ও নানাধরনের বাটি পাওয়া গেছে। ধাতুশিল্প খুব উন্নত ছিল। সোনার গয়না, ব্রোঞ্জ পাত, তামার পাত্র, নানা ধাতুর তৈরি কুঠার, করাত, বাটালি ও ছুরি পাওয়া গেছে। ব্রোঞ্জশিল্প খুব উন্নত ছিল। তারা *cire*

perdue পদ্ধতিতে ব্রোঞ্জ ঢালাই করত। মহেঞ্জোদাড়োর বিখ্যাত নর্তকীমূর্তিটি এই পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছিল।

হরপ্পাবাসীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হল সিলমোহর, বিশেষত জম্বুজানোয়ারের ছবি দেওয়া সিলমোহর। লাল বেলপাথরে তৈরি একটি পুরুষদেহ সম্ভবত প্রতিকৃতি অঙ্কনের প্রয়াস। হরপ্পা থেকে পাওয়া ব্রোঞ্জের নর্তকী মূর্তিটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নারীমূর্তি। নগ্না অলংকারশোভিতা, হাতে অনেকগুলি চুড়ি পড়া মূর্তিটির দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাটি কামোদ্দীপক। যদিও, প্রস্তর শিল্প খুব একটা উন্নত ছিল না। একটা দেখাও যেত না। তবে মহেঞ্জোদাড়ো থেকে পাওয়া দাড়িওয়ালা পুরুষের প্রস্তরমুণ্ডটি একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পদ্রব্য।

মাটির পাত্রগুলিতে সুন্দরভাবে রং করা থাকত। প্রধানত লাল, কালো ও সবুজ রং করা হত। হলুদ রঙের ব্যবহার ছিল খুব কম। মানুষ ও পশুর পোড়ামাটির মূর্তি ও খেলনা দেখে মনে হয়, হরপ্পাবাসীরা শিল্পরসিক ছিল। ব্রোঞ্জ, পাথর ও বেলপাথরের মূর্তি দেখে মনে হয়, তাদের শিল্পবোধ খুব উঁচুদরের ছিল। তবে চিত্রকর্মে তাদের বিশেষ দক্ষতা ছিল বলে মনে হয় না। সেই প্রমাণ কমই মিলেছে। মৃৎশিল্পেও তাদের বেশ দক্ষতা ছিল।

বিজ্ঞান

হরপ্পাবাসীরা খনিজ ধাতুশিল্প ও সুপরিকল্পিত গৃহনির্মাণে পটু ছিল। কোনো কোনো বাড়ি তো দোতলার থেকেও বেশি উঁচু ছিল। তারা জিপসাম সিমেন্ট তৈরি করত, যার মাধ্যমে শুধু পাথরই নয়, ধাতুও জুড়ত। দীর্ঘস্থায়ী রং ও ডাই তৈরি করতে জানত তারা। মহেঞ্জোদাড়োয় যে গণ-স্নানাগারটি পাওয়া গিয়েছে, সেটিতে অসাধারণ এক জলনির্গমন ব্যবস্থা দেখা যায়।

সমাজ জীবন

শ্রেণী

আর্যদের বর্ণব্যবস্থার মতো হরপ্পায় কোনো বর্ণব্যবস্থা ছিল কিনা জানা যায় না। তবে ধ্বংসস্তূপে খননকার্য চালিয়ে পাওয়া প্রমাণ থেকে মনে হয়, বর্ণব্যবস্থা না থেকলেও শ্রেণি ছিল। সমাজে পুরোহিত ও সাধারণ মানুষের আলাদা শ্রেণী ছিল।

পোষাক ও অলংকার

সিন্ধুবাসীদের পোষাক সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। সিন্ধুবাসীদের সিলমোহরের ছবি, মূর্তি ও সুতোকাটার যন্ত্রপাতি থেকেই পোষাকের যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে অলংকারের ব্যবহার নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই ছিল। কণ্ঠহার, চুল-বাঁধার অলংকার, বাহুর অলংকার, আঙুটি ও চুড়ি নারীপুরুষ উভয়েই পরত। কোমরবন্ধ, নাকছাবি, কানের

দুল ও নূপুর কেবল মেয়েরাই পড়ত। সিলমোহরে চুলের কাঁটা ও চিরুনির ছবি পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো থেকে পাওয়া মূর্তি থেকে প্রমাণিত হয় সেখানকার লোকেরা কেশসজ্জা করত। এমনকি এখানকার লোকেরা এক ধরনের সুর্মা, ফেস-পাউডার, লিপস্টিক, ফেস-পেইন্ট ও সুগন্ধী ব্যবহার করত, যা বাইরে রঙানিও করা হত।



মহেঞ্জোদাড়োর পুরোহিত মূর্তি

ধর্মজীবন

হরপ্পাবাসীদের ধর্মজীবন সম্পর্কে অল্প কয়েকটি কথাই জানা যায়। প্রধান পুরুষদেবতা ছিলেন সম্ভবত ‘পশুপতি মহাদেব’ যাকে ‘প্রোটো-শিব’ বা শিবের আদিরূপ বলে করা হয়। একটি সিলমোহরে তাঁর যোগীমূর্তি খোদিত আছে। তাঁর তিনটি মুখ ও দুটি সিং; তাঁকে ঘিরে আছে চারটি পশু – হাতি, বাঘ, গণ্ডার ও মোষ; পায়ের কাছে দুটি হরিণ। একটি মাতৃদেবতার মূর্তি পাওয়া গিয়েছে যিনি সম্ভবত প্রজননের দেবী। যোনি ও পুরুষাঙ্গের চিহ্ন দেখে মনে হয় যৌনাঙ্গের প্রতীকপূজার হত। প্রজনন সংস্কৃতি (ফার্টিলিটি কাল্ট) ধর্মের একটি মুখ্য অঙ্গ ছিল। কালিবঙ্গান, লোথাল ও হরপ্পার অগ্নিবেদী দেখে মনে হয়, অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল। পিপুল প্রভৃতি গাছ ও ইউনিকর্ন প্রভৃতি জন্তু পূজা করা হত। তারা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করত বলে মন্ত্রপূত কবচ ব্যবহার করত।



পশুপতি সিলমোহর

হরফ

হরপ্পাবাসীদের ব্যবহৃত হরফে ৪০০ থেকে ৫০০টি চিহ্নের সন্ধান পাওয়া যায়। এই হরফে এক একটি চিহ্ন দ্বারা এক একটি জিনিসকে বোঝানো হত। হরপ্পার লিপির পাঠোদ্ধার করা না গেলেও, কালিবঙ্গান থেকে প্রাপ্ত ভাঙা মৃৎপাত্রের টুকরোয় পাওয়া লেখা থেকে প্রমাণিত হয়েছে ডান থেকে বামে এবং বাম থেকে ডানে উভয় দিকেই লেখা চলত।

আমোদপ্রমোদ

হরপ্পাবাসীদের মধ্যে ইনডোর ও আউটডোর উভয় ধরনের খেলাই প্রচলিত ছিল। তার নাচগানও করত। নলাকার ও শাক্বাকার পাশার ঘুঁটি থেকে প্রমাণিত হয় হরপ্পায় জুয়াখেলাও চলত। আধুনিক দাবার মতো একটা খেলাও তারা খেলত। মার্বেল-পুতুল ও জন্তুজানোয়ারের খেলনামূর্তি দেখে মনে হয়, মহেঞ্জোদাড়োর শিশুদের মধ্যে এই সব খেলনার বেশ চাহিদা ছিল। মাছ-ধরা ও পশুশিকার ছিল আমোদপ্রমোদের অন্যান্য মাধ্যম।

মৃতদেহ সৎকার

হরপ্পাবাসীরা কিভাবে মৃতদেহ সৎকার করত তা সঠিকভাবে জানা যায় না। মনে করা হয়, মৃতদেহ দাহ করে ভস্ম সমাধিস্থ করা হত। খুব কম ক্ষেত্রেই দেখাবশেষ পশুপাখি দিয়ে খাওয়ানোর পর সমাধিস্থ করা হত। তবে হরপ্পার আর-৩৭ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মৃতদেহ সরাসরি সমাধিস্থ করাও একটা বহুপ্রচলিত প্রথা ছিল।

শাসনব্যবস্থা

হরপ্পার রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কেও বেশি কিছু জানা যায় না। সম্ভবত হরপ্পার শাসকরা রাজ্যজয়ের থেকে ব্যবসাবাণিজ্যেই বেশি মনোনিবেশ করতেন। হয়তো, এক শ্রেণীর বণিকরাই দেশ শাসন করতেন। অ্যামারি ডে রেইনকোর্টের মতে, “প্রাপ্ত প্রমাণাদি থেকে মনে হয়, শাসনব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের এবং সুসংহত কেন্দ্রমুখী; উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং খুব সম্ভবত একটা অত্যন্ত কার্যকর করব্যবস্থারও অস্তিত্ব ছিল।” নিকাশি, নগর পরিকল্পনা ও পণ্যবস্তু থেকে প্রমাণিত হয় নাগরিক পরিষেবার জন্য পুরসভা জাতীয় কোনো সংগঠনও ছিল।

অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক

সমসাময়িক বিশ্বের মেসোপটেমিয়া, মিশর, তুর্কমেনিয়া, ওমান ও বাহরিনের সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পাবাসীদের যোগাযোগ ছিল। হরপ্পার শামুকের খোলা ও কার্নেলিয়ান পুঁতি মেসোপটেমিয়ার রাজকীয় সমাধি থেকে পাওয়া গিয়েছে। মেসোপটেমিয়ার সাহিতে

মেলুহার কাঠ, সোনা ও লাপিস লাজুলির উল্লেখ রয়েছে। হরপ্পাবাসীদের সিলমোহর ও অন্যান্য বস্তু মেসোপটেমিয়ার সুরা, কিস, নিম্বুর ও উর শহরে পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পার সঙ্গে মিশরের যোগাযোগের সম্পূর্ণ ইতিহাস জানা যায় না। তবে মিশর ও মহেঞ্জোদাড়োর মৃৎপাত্রগুলির কিছু মিল এবং দুই অঞ্চলের হরফের মধ্যে মিলও লক্ষ্যণীয়। হরপ্পার মতো শস্যগার দক্ষিণ আফগানিস্তানেও পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পায় পাওয়া একটা সিলে ইগল পাখির ছবি দেখে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে হরপ্পাবাসীদের যোগাযোগের কথা অনুমিত হয়। মধ্য এশিয়ায় পাওয়া খোদাই-করা কার্নেলিয়ান পুঁতি, হাতির দাঁতের দণ্ড, একটি রূপোর কবচ ও দুটি সিলমোহরকে ঐতিহাসিকরা হরপ্পার জিনিস মনে করেন। হরপ্পার খোদাই-করা কার্নেলিয়ান পুঁতি ও হাতির দাঁতের জিনিস বাহরিনেও পাওয়া গিয়েছে।

পতন

১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ सिन्धु সভ্যতার প্রধান প্রধান শহরগুলি একে একে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। শেষপর্যন্ত শহরগুলি জনশূন্য হতে থাকে। ঠিক কি কারণে এমনটি ঘটেছিল তা সঠিক জানা যায় না। ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে।

এইচ. টি. ল্যামবার্ক, রবার্ট রেইকিস প্রমুখের মতে, নদীর গতি পরিবর্তন, বন্যা ও ভূমিকম্পই सिन्धু সভ্যতার পতনের কারণ। এই সব অঞ্চলে বন্যার অনেক প্রমাণ রয়েছে। বন্যাবাহিত পলির উপর বাড়ি পুনর্নির্মিত হত। কোনো কোনো জায়গায় মাটি থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত পলিস্তর দেখা গিয়েছে। তাছাড়া सिन्धু উপত্যকা ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকা। তাই তাঁরা মনে করেন, হয় ভূমিকম্পের ফলে নদীর গতিপথ বদলে শহরে জল ঢুকে শহর ধ্বংস করে, নয়তো ভূমিকম্পের ফলে জমির উত্থানপতন বন্দর এলাকাকে মূল অঞ্চল থেকে পৃথক করে দেয়। ফলে বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এই তত্ত্ব सिन्धু উপত্যকার বাইরের নগরকেন্দ্রগুলির পতনের কারণ ব্যাখ্যা করে না। এইচ. টি. ল্যামব্রিকের মতে, सिन्धু নদের গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে তা মহেঞ্জোদাড়ো থেকে দূরে সরে যায়। নগরবাসী ও পার্শ্ববর্তী কৃষিক্ষেত্রগুলির লোকজনে জলের অভাবে অন্যত্র চলে যায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বায়ুপ্রবাহের ফলেই পরিত্যক্ত মহেঞ্জোদাড়ো পলিস্তরের তলায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু এই তত্ত্বও শুধুমাত্র মহেঞ্জোদাড়ো শহরটি জনশূন্য হওয়ার কারণই ব্যাখ্যা করে। তা সামগ্রিকভাবে सिन्धু সভ্যতার পতনের কারণ ব্যাখ্যা করে না।

ডি. পি. আগরওয়াল ও সুডের মতে, ঘগ্নর নদীর শুকিয়ে যাওয়া ও এই অঞ্চলের আবহাওয়ায় শুষ্কতা বৃদ্ধিই হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকেই এই অঞ্চল শুকাতে শুরু করেছিল। এই অবস্থায় হরপ্পার মতো প্রায়-শুষ্ক অঞ্চলগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে এখানকার কৃষিব্যবস্থার পতন ঘটে। ভূমিকম্পকেও ঘগ্নর নদীর শুকিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী করা হয়। এই তত্ত্ব বিশ্বাসজনক হলেও, ঘগ্নর নদীর শুকিয়ে যাওয়ার সঠিক তারিখটি জানা না যাওয়ায় এটি সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায়নি।

মর্টিমার হুইলারের মতে, বহিরাগত আর্যদের আক্রমণের ফলেই এই সভ্যতার পতন ঘটে। এখানকার পথে ঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। মনে করা হয়, শহর যখন পতনোন্মুখ তখনই বহিরাগত কোনো শক্তির হাতে তা আক্রান্ত হয়। কিন্তু সমস্যা হল, আর্যদের আগমন ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে ঘটেনি। তাহলে কিভাবে ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হতে পারে?

ওয়াল্টার ফেয়ারসার্বিসের মতে, বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যাই সভ্যতার পতনের মূল কারণ। তাঁর মতে, আধা-শুষ্ক অঞ্চলে কৃষিপণ্যের ক্রমাগত চাহিদাবৃদ্ধি এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এখানে চাষাবাদ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অধিবাসীরা গুজরাত বা পূর্বদিকে চলে যায়। তারপর বহিরাগতদের আক্রমণে এই সভ্যতার চূড়ান্ত পতন ঘটে। এই মতটিকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। তবে সিন্ধু সভ্যতার সম্পর্কে পাওয়া তথ্যগুলি এতই অল্প ও সীমাবদ্ধ যে তার ভিত্তিতে এই মতকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

পতনের সঠিক কারণ বুঝতে না পারার সমস্যা থেকে কয়েকজন ঐতিহাসিক মনে করেন, সিন্ধু সভ্যতার আদর্শে কোনো ‘পতন’ ঘটেনি। শুধু শহরগুলির পতন ঘটেছিল। তারপরে কালক্রমে সিলমোহর, হরফ ও মাটির জিনিসপত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে নগরসভ্যতাটি হারিয়ে যায়। হরপ্পাবাসীরা তাদের কিছু ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখে আশেপাশের কৃষিজীবী সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়।

